ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৩

গণমাধ্যম, বাক্‌স্বাধীনতা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

জাফর সাদিক
অ্যাসিস্ট্যান্ট কোঅর্ডিনেটর, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

০৯ ডিসেম্বর ২০২৩

গণমাধ্যম, বাক্‌স্বাধীনতা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

জাফর সাদিক*

মানুষের মত, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে কথা বলার অধিকার বা বাক্‌স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বিশ্বাস করতেন, 'আমি তোমার কথার সাথে একমত না-ও হতে পারি, কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকারের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করবো'।[১] এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, কথা বলার স্বাধীনতা তথা বাক্‌স্বাধীনতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এই কথা বলার জন্য, বাক্‌স্বাধীনতা চর্চার জন্য নানা সময়ে, নানা মাধ্যমে মানুষ নিগ্রহ বা নিপীড়নের শিকার হয়। বিশেষ করে, বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার যেখানে সংকুচিত, সেখানে সাংবাদিকরা স্বাভাবিকভাবেই হুমকিতে থাকেন, হুমকিতে পড়ে স্বাধীন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা।

বাংলাদেশের সংবিধান ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারে বাক্‌স্বাধীনতার কথা বলা হলেও, নানা আইন এবং তার অবাধ প্রয়োগে বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অনেক সময়ই অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা বিদ্যমান। আবার মত ও চিন্তা প্রকাশের সাথে বাক্‌স্বাধীনতাকে এক করে দেখায়, আইনী পরিসরে কথা বলার অধিকার বা বাক্‌স্বাধীনতা নানাভাবে সংকুচিত হয়। আর এতে করে কাগজে-কলমে কিংবা রাজনৈতিক বক্তব্যে অবাধ বাক্‌স্বাধীনতার কথা বলা হলেও, নানা 'ব্যতিক্রম' কিংবা দায়মুক্তির ছদ্মাবরণে তা হরণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

এই প্রবন্ধে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে বাক্‌স্বাধীনতা বা কথা বলা কীভাবে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় তা বিশ্লেষণ করবো। এছাড়া এতে করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকগণ কীভাবে ঝুঁকির মুখে পড়েন, নিগৃহিত হন- এ বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি, বিদ্যমান বিভিন্ন আইনে ব্যতিক্রম বা সাংবিধানিক সুরক্ষার আওতাবহির্ভূত ধারা-উপধারাসমূহ বিন্যাসের মাধ্যমে বাক্‌স্বাধীনতার বৈশ্বিক অঙ্গীকার ও সাংবিধানিক অধিকারকেই কীভাবে ঝুঁকিতে ফেলা হয়েছে, সে বিষয়েও আলাপ আসবে। প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রবন্ধে চিন্তা ও মত প্রকাশ এবং বাক্‌স্বাধীনতার তুলনামূলক বিশ্লেষণসহ এর ঐতিহাসিক নির্ঘন্ট এবং সাম্প্রতিক বাংলাদেশের নানা উদাহরণ আলোচনায় এসেছে।

বাক্‌স্বাধীনতার ঐতিহাসিক যাত্রাপথ:

আধুনিক সময়ে বাকস্বাধীনতাকে মানুষের জন্মগত অধিকার হিসেবে দেখা হয়, যা মানুষের মৌলিক অধিকারের মতই অবিচ্ছেদ্য। সাম্প্রতিক ইতিহাসে বাক্‌স্বাধীনতাকে ফরাসী বিপ্লবোত্তর কালে উদ্ভূত রেঁনেসার ফল হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, কথা বলার স্বাধীনতার সংগ্রাম– দীর্ঘ যাত্রার এক ইতিহাস।

প্রাচীন গ্রিসে বাক্‌স্বাধীনতা বোঝাতে 'ইসেগোরিয়া' ও 'পারহেসিয়া' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হতো। এ দু'টি শব্দের মধ্যে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই 'ইসেগোরিয়া' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়, যার অর্থ 'জনতার মাঝে কথা বলার সমান অধিকার'। আর 'পারহেসিয়া' হলো, অন্যকে আঘাত করে হলেও কথা বলার অধিকার। এর মধ্যে ইসেগোরিয়াই বাক্‌স্বাধীনতার সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাচীনতম ধারণা, যা এথেন্সবাসী তাদের গণপরিষদে সবার কথা বলার সমান অধিকারের জন্য স্বীকৃতি দিয়েছিলো। আর 'পারহেসিয়া' নাটক ও শিল্পের অন্যান্য ধারায় বহুল ব্যবহৃত ছিলো।[২]

গ্রীক সভ্যতার হাজার বছর পর, ফরাসী বিপ্লবোত্তর আধুনিক রেনেসাঁর কালে বৃটেনে ১৬৮৯ সালে 'ইংলিশ বিল অফ রাইটস' প্রণীত হয়, যা সংসদ সদস্যদের 'আইন পরিষদে কথা বলা ও বিতর্কের স্বাধীনতা' প্রদান করে। যদিও ফরাসী বিপ্লবের বেশ কয়েক বছর আগেই জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট 'বাক্‌স্বাধীনতা' বলতে 'জনপরিসরে ব্যক্তির যুক্তিবাদী ক্ষমতার ব্যবহার করার ক্ষমতা'-কে নির্দিষ্ট করেন। কান্টের শতাব্দীরও পরে ব্রিটিশ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮৫৯) তাঁর 'অন লিবার্টি' গ্রন্থে ব্যক্তির 'চিন্তা ও আলাপের স্বাধীনতা'-কে বাক্‌স্বাধীনতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। মিল রাষ্ট্রের পাশাপাশি চারপাশের নাগরিকদের 'সামাজিক

---

[১] Tallentyre, S.G. (1906). "Helvétius: The Contradiction". The Friends of Voltaire. London: Smith, Elder, & Co. p. 199 – via Internet Archive.

[২] https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/12/two-concepts-of-freedom-of-speech/546791/
https://repository.arizona.edu/handle/10150/625325

অত্যাচার’ থেকে ব্যক্তির কথা বলার অধিকারকেও বাক্‌স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত করেন। আইরিশ স্কলার জে. বি. বিউরি তার ‘চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস (A History of Freebom of Thought)’ গ্রন্থের শুরুতেই বলেন যে, চিন্তার স্বাধীনতার ইতিহাস আসলে বাক্‌স্বাধীনতারও ইতিহাস। ‘কথা বলার স্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া চিন্তার স্বাধীনতা কোনো অর্থ বহন করে না’।[৩]

ফরাসী বিপ্লবের দু'বছর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে বাক্‌স্বাধীনতা যুক্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় ‘The Diclaration of the Rights of Man and of the Citizen’-এর ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়, প্রত্যেক নাগরিকই কথা বলা, লেখা ও প্রকাশনার স্বাধীনতা রাখেন।[৪] বর্তমানে ‘জাতিসঙ্ঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা’ তথা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের ১৯ অনুচ্ছেদ,[৫] মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় সনদের ১০ অনুচ্ছেদ[৬] এবং মানবাধিকার ও গণ অধিকারের আফ্রিকান সনদের ৯ অনুচ্ছেদ[৭]-এ বাক্‌স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে।

বাক্‌স্বাধীনতা বনাম চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা:

বাক্‌স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশ ও চিন্তার স্বাধীনতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু পার্থক্য আছে।

- *বাক্‌স্বাধীনতা* হলো শাস্তি বা প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই নিজের মতামত ও বিশ্বাস প্রকাশের অধিকার। এর মধ্যে রয়েছে জনসমক্ষে স্বাধীনভাবে কথা বলা, নিজের চিন্তাভাবনা লেখা ও প্রকাশ করা এবং সরকারি নীতির সমালোচনা ও বিরোধিতা এবং প্রতিবাদ করার অধিকার। বাক্‌স্বাধীনতাকে একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়; কারণ এটি ধারণা ও তথ্যের উন্মুক্ত বিনিময়ের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য।

- মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাক্‌স্বাধীনতা থেকে আরো বিস্তৃত, যা কেবল বাক্‌স্বাধীনতাই নয়- শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যের মতো জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজের যে কোনো বিষয়ে মত প্রকাশের অন্যান্য রূপকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এতে তথ্য ও ধারণা গ্রহণ, প্রদান কিংবা চাওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত। একটি বৈচিত্রময় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য।

- *চিন্তার স্বাধীনতা হলো*, কোন ধরণের হস্তক্ষেপের ভয় ছাড়াই যে কোনো মতামত বা বিশ্বাস ধারণ করার অধিকার। এর মধ্যে রয়েছে বিবেক বা চৈতন্য ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার। চিন্তার স্বাধীনতা ব্যক্তির নিজস্বতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আবশ্যকীয়; কারণ এটি মানুষকে তার চারপাশের বিশ্ব সম্পর্কে নিজস্ব বিশ্বাস গঠনের সুযোগপ্রদান করে।[৮] [৯] [১০]

আইনিভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অধিকতর বিস্তৃত; কারণ এতে বাক্ ও চিন্তার স্বাধীনতা দু'টিই অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন দার্শনিক রোনাল্ড ডোয়ার্কিন (২০০৬) এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন, ‘বাক্‌স্বাধীনতা একটি নেতিবাচক স্বাধীনতা, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইতিবাচক স্বাধীনতা।’ তার মতে, বাক্‌স্বাধীনতা একটি নেতিবাচক স্বাধীনতা হওয়ার কারণ হলো- এটি মানুষকে তাদের মতামত প্রকাশের জন্য কোন ধরণের শাস্তি থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হল একটি ইতিবাচক স্বাধীনতা; কারণ এটি মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে দেয়।’[১১]

---

[৩] https://www.gutenberg.org/cache/epub/10684/pg10684-images.html; translated by Mitra, Priti Kumar (2007), Bangla Academy

[৪] https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/sur%20la-declaration-des-droits-de-l-homme.asp

[৫] https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

[৬] https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention

[৭] https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights

[৮] https://law.justia.com/constitution/us/amendment-01/

[৯] https://www.amnesty.org/en/what-we-do/freedom-of-expression/

[১০] https://digitallibrary.un.org/record/3956409?ln=en

[১১] Dworkin, Ronald. "Freedom of Speech." Sovereign Virtue: Studies in the Theory of Justice (2006).

অন্যদিকে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮৫৯) যুক্তি দেন যে, সত্য আবিষ্কারের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। তিনি মনে করেন, একটি মতামত সত্য না মিথ্যা, তা জানার একমাত্র উপায় হল উন্মুক্ত বিতর্ক এবং সমালোচনার জন্য এটি প্রকাশ করা। যদি কিছু মতামতকে চাপা দিয়ে রাখা হয়, তাহলে কখনোই সত্য আবিষ্কার করা যাবে না।[১২]

বাক্‌স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতার পার্থক্য নিয়ে বহু শতাব্দী ধরেই বিতর্ক চলছে। কোন্ স্বাধীনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এর কোন সহজ উত্তর নেই। তবে, এই তিনটিই সামগ্রিক ও পারস্পরিকভাবে সুস্থ্য গণতন্ত্র ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের জন্য অপরিহার্য।

বাক্‌স্বাধীনতা ও বাংলাদেশের আইনী কাঠামো:

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। [১৩]

সাধারণভাবে বাক্‌স্বাধীনতা বলতে এমন নীতি– যা কোনো ব্যক্তির বা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির ভাবনা, চিন্তা ও মতামত কোন প্রতিশোধ, সেন্সরশীপ বা আইনী ব্যবস্থার ভয় ব্যতিরেকে প্রকাশের ক্ষমতাকে বোঝালেও, বাংলাদেশের সংবিধানের এই অধিকার কিছু 'ব্যতিক্রম'-ক্ষেত্রে রহিত বা সীমিত (Restricted) করা হয়েছে। কিছু অধিকার জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্য, কিছু নৈতিকতার ভিত্তিতে এবং কিছু অধিকার জননিরাপত্তার ভিত্তিতে রহিত বা সীমিত করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধগুলো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে, বা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধের প্ররোচনা সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। এই যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধগুলি (Resonable Restrictions) কিছু সংবিধিবদ্ধ আইন (Statutory Laws) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; যেমন দণ্ডবিধি, ১৮৬০, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ ইত্যাদি।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ১৯-এ সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও, তা ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (International Covenant on Civil and Political Rights)-এ গ্রহণের সময় অন্যের অধিকার কিংবা সম্মান রক্ষার জন্য এবং জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তা, জন আদেশ, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা রক্ষায় যে কোনো মত প্রদানকারীকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে বলে কিছু 'ব্যতিক্রম' (Restriction) যুক্ত করা হয়েছে।[১৪] এর সুযোগে চীন, উত্তর কোরিয়া কিংবা মিয়ানমারের মতো কঠোর সেন্সরশীপ আরোপকারী কিংবা কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার অধীনে শাসিত দেশগুলোতে ব্যক্তির যে কোন স্বাধীন মতামতকে উপরোক্ত কোনো না কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত করে রুদ্ধ করা হয়। এমনকি, সীমিত বা হাইব্রিড গণতান্ত্রিক কিংবা রাজতান্ত্রিক, এমনকি সর্বোচ্চ মাত্রার গণতান্ত্রিক দেশের শাসকদের হাতেও অনেক সময় এসব 'ব্যতিক্রম'কে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণের ঝুঁকি থাকে।

বাংলাদেশের সংবিধানে বাক্ বা মত প্রকাশের উপর যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ (Resonable Restrictions) আরোপের কারণসমূহ সাপেক্ষে এ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনগুলোর সুনির্দিষ্ট কয়েকটি উদাহরণ হলো–[১৫]

---

[১২] Mill, John Stuart. On Liberty (1859).

[১৩] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30005.html

[১৪] https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf

[১৫]https://www.researchgate.net/profile/M-Jashim-Chowdhury/publication/336445705_Media_and_Broadcast_Law_In_Bangla/links/5da11af845851553ff88dd62/Media-and-Broadcast-Law-In-Bangla.pdf

- *রাষ্ট্রের নিরাপত্তা:* দন্ড বিধি ১৮৬০, পোস্ট অফিস আইন ১৮৬৯, টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫, বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০১, কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন ২০০৬, বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ আইন ২০০১, চলচিত্র সেন্সরশিপ আইন ১৯৬৩, সিনেমাটোগ্রাফি আইন ১৯১৮, উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩ (খসড়া) ইত্যাদি।
- *বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক:* বৈদেশিক সম্পর্ক আইন ১৯৩২।
- *জনশৃঙ্খলা:* বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, সংবিধানের জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধানাবলী (অনুচ্ছেদ ১৪১খ ও ১৪১গ)।
- *শালীনতা ও নৈতিকতা:* - অশালীন বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরন আইন ১৯৬৩।
- *আদালত অবমাননা:* সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদ, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (ধারা ১৯৫, ৪৭৬,৪৮০-৪৮৭), দন্ড বিধি ১৮৬০ (ধারা ১৭২-১৯০,২২৮) এবং দেওয়ানী কার্যবিধি (ধারা ১৩৫ ও ১৫১)।
- *মানহানি:* দন্ড বিধি ১৮৬০ (ধারা ৪৯৯), তাছাড়া বাংলাদেশে মানহানি সংক্রান্ত দেওয়ানি আইন এখনও বিধিবদ্ধ আকারে সংকলিত হয়নি। আদালতগুলো সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে ইংলিশ টর্ট আইন প্রয়োগ করে থাকে।
- *অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা:* দন্ড বিধি ১৮৬০।

নিচের ছকে সংবিধানে উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ (Resonable Restrictions) আরোপের কারণসমূহ সাপেক্ষে এ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনগুলোর বিভিন্ন ধারা-উপধারা সংযুক্ত করা হলো–

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বাক্স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ (Resonable Restrictions) আরোপিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও সাংবিধানিক বিধি[১৬] *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট, অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট, উপাত্ত সুরক্ষা আইন যুক্ত হতে পারে।)*

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা	বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক	জনশৃঙ্খলা	শালীনতা ও নৈতিকতা	আদালত অবমাননা	মানহানি	অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা
দন্ড বিধি, ১৮৬০ ধারা- ১২৩ এ, ১২৪ এ, ১৫৩ এ/বি, ১০৫ এ, ২৯৮ এবং ২৯৫এ	**বৈদেশিক সম্পর্ক আইন ১৯৩২** (বিশেষত ধারা ২)	**বিশেষ নিরাপত্তা আইন, ১৯৭৪** বিশেষত ধারা ৩ এ/বি, ২৫ ডি	**দন্ড বিধি, ১৮৬০** ধারা- ৫০৯	**দন্ড বিধি, ১৮৬০** ধারা ১৭২-১৯০, ২২৮	**দন্ড বিধি, ১৮৬০** ধারা- ৪৯৯, ৫০১, ৫০২	**দন্ড বিধি, ১৮৬০** ধারা- ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১২-১১৪, ১১৭, ১১৯
পোস্ট অফিস আইন, ১৮৬৯ ধারা- ২০, ২১,২৬, এবং ২৭ এ/বি		**বাংলাদেশ সংবিধানের জরুরি বিধান** অনুচ্ছেদ ১৪১ বি/সি	**অশালীন বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরন আইন, ১৯৬৩** ধারা- ৩, ৬	**বাংলাদেশ সংবিধান** অনুচ্ছেদ ১০৮		
টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ ধারা- ৫, ২৪-২৬, ২৯,				**ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮** ধারা ১৯৫, ৪৭৬, ৪৮০- ৪৮৭		
				দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ ধারা ১৩৫ ও ১৫১		
				আদালত অবমাননা আইন, ২০১৩ আরা ২(৬) , ৪ (১), ৫ (এ/বি), ৬		

[১৬]https://www.researchgate.net/publication/375076428_Constitutional_Reasonable_Restrictions_on_Right_to_Expression_under_Different_laws_of_Bangladesh

এসব অপরাধের শাস্তি নির্দিষ্ট মেয়াদে কারাদন্ড থেকে শুরু করে আজীবন কারাদন্ড এবং নির্দিষ্ট অংকের অর্থদন্ড। অথচ উল্লিখিত আইনসমূহের অনেক ধারাই অস্পষ্ট কিংবা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সংবিধান অনুযায়ী উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ (Resonable Restrictions) নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইনের আওতায় সরকার কোন ধরণের বাধা-নিষেধ আরোপ করতে চাইলে এর যৌক্তিকতা (reasonableness) বিচারের ভার আদালতের। এমনকি অপরাধের মাত্রা নির্ধারণের ভারও আদালতের কাছেই থাকে। অথচ যৌক্তিকতা যাচাই এর জন্য সবক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য কিংবা অপরাধের মাত্র নির্ধারণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নেই। তবে ৩৯ অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করলে যৌক্তিকতা নির্ধারনের কতগুলো সাধারণ মানদন্ড খুজে পাওয়া যায়। যেমন–

- *কার্যকারণ সম্পর্ক (Causational Relation)*: ৩৯ অনুচ্ছেদের ‘in the interests of’ শব্দগুলোর প্রেক্ষিতে কোনো ধরণের নিয়ন্ত্রণ বৈধ হতে হলে সেটিকে অবশ্যই আইন প্রণেতারা যে উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণটি আরোপ করতে চান তার সাথে কার্যকারণ সুত্রে সংশ্লিষ্ট হতে হবে (proximately related to the object which the legislature seeks to achieve)। যেমন, জনশৃঙ্খলার স্বার্থে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলে ঐ নিয়ন্ত্রণটি যৌক্তিকভাবেই জনশৃঙ্খলা সম্পর্কিত এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রকৃত প্রয়োজনেই আরোপিত হবে। কোন কাল্পনিক সম্পর্ক দেখিয়ে সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়।

- *সীমাবদ্ধতার মাত্রা (Limit of Restriction)*: যৌক্তিক হতে হলে, যে অন্যায়টি প্রতিহত করার জন্য সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে সেটির জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি মাত্রার সীমাবদ্ধতা হতে পারবে না। যে আইন বা আদেশ স্বেচ্ছাচারী ও মাত্রাতিরিক্তভাবে নাগরিকের অধিকার ক্ষুন্ন করে, তাকে সাংবিধানিক দৃষ্টিতে যৌক্তিক বলা যায় না।[১৭]

সংবিধানসম্মত বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ (Resonable Restrictions) আরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ আইনই (দন্ড বিধি, ১৮৬০, পোস্ট অফিস আইন, ১৮৬৯, টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫, বৈদেশিক সম্পর্ক আইন ১৯৩২, অশালীন বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধকরন আইন, ১৯৬৩, ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮) ঔপনিবেশিক শাসনামলে (Colonial Rule) তৈরি করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার মূলমন্ত্রই ছিলো মানুষের সকল মৌলিক অধিকারসহ সার্বিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা। উপনিবেশ বিদায় নিয়েছে, ঔপনিবেশিক মানচিত্র ভাগ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে, কিন্তু এখনো ঔপনিবেশিক আইনী উত্তরাধিকার আমরা বহন করে চলেছি। যার ফলস্বরূপ, বাক্‌স্বাধীনতার চর্চায় অপরাধ ও তার শাস্তি এখনও নিপীড়ক ঔপনিবেশিক মানদন্ডেই নির্ণিত হয়ে চলছে। ফলশ্রুতিতে বাক্‌স্বাধীনতাই কখনো কখনো অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, যার পরিবর্তন জরুরি।

গণমাধ্যম, বাক্‌স্বাধীনতা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা:

গণমাধ্যমের জন্য বাক্‌স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাক্‌স্বাধীনতার সাথে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেমন যুক্ত, তেমনি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তথ্য প্রকাশ ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা জন্য বাক্‌স্বাধীনতা অপরিহার্য।

১৭৬৬ সালে সুইডেনে অ্যান্ডার্স শিডেনিয়াস নামে এক অস্ট্রো-বথনিয় পুরোহিতের উদ্যোগে পৃথিবীর প্রথম ‘সংবাদপত্রের স্বাধীনতা’ আইন প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় নাগরিকরা রাজা ও চার্চ ছাড়া আর যে কোন বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারতেন।[১৮] পরবর্তীতে ফরাসী বিপ্লবের সময় ‘The Diclaration of the Rights of Man and of the Citizen’-এ এবং ১৯৪৮ সালে ‘জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা’য়ও সংবাদ প্রকাশের এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি রয়েছে।

---

[১৭] প্রাগুক্ত১৫

[১৮] প্রাগুক্ত১৫

অন্যদিকে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য যদি হয় 'গোপন' বা 'লুকিয়ে রাখা' তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা, তাহলে বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার ব্যতিত তা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইউনেস্কো প্রকাশিত 'স্টোরি-বেইজড এনকোয়ারি' হ্যান্ডবুকে বলা হয়েছে, 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপন বা লুকিয়ে রাখা তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। সাধারণত ক্ষমতাবান কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এসব তথ্য গোপন রাখে; কখনো হয়তোবা বিপুল ও বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে থাকা তথ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যা চট করে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই কাজের জন্য একজন সাংবাদিককে সাধারণত প্রকাশ্য ও গোপন নানা উৎস (সোর্স) ব্যবহার করতে হয়, ঘাঁটতে হয় নানা ধরনের নথিপত্র।'[১৯] আর এজন্যই সাংবাদিকের বাক্‌স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ। শতাব্দীকাল ধরেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও কর্পোরেট শোষণের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখছে (শিফরান ২০১৪)।[২০]

তবে নিও-লিবারেল অর্থনীতিতে কর্পোরেট পুঁজির মালিকের হাতেই অনেক সময় গণমাধ্যমের ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। তাত্ত্বিক জুডিথ লিখটেনবুর্গ যেমন মনে করেন যে বর্তমান পৃথিবীতে 'টাকা নেই তো কথাও নেই'।[২১] তাই গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার অনেক সময়ই ক্ষমতাশালীদের সুবিধা দেয়, সুরক্ষা দেয়। আবার সংশ্লিষ্ট সরকারকেও বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারে যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ (Resonable Restrictions) আরোপের সুযোগ করে দেয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই, অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান তাদের মালিকপক্ষের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা ঢাল হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি আবার অনেকেই সরকারের সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্তকে ঢালাওভাবে সমর্থন করে থাকে।[২২] তারপরও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য বাক্‌স্বাধীনতা বা কথা বলার স্বাধীনতা অপরিহার্য। সাংবাদিকের তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান এবং প্রাপ্ত তথ্য সংবাদ আকারে প্রকাশ করার জন্য এই বাক্‌স্বাধীনতার বিকল্প নেই।

একটি 'মুক্ত সমাজ' (Free Socity)-এর জন্য মুক্ত বা স্বাধীন গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্ত গণমাধ্যমের জন্য স্বাধীন সাংবাদিকতা অন্যতম শর্ত, যেখানে ভয়-ভীতি কিংবা সেন্সরশিপ ছাড়াই অবাধ সংবাদ প্রকাশ করার সুযোগ থাকে, পক্ষে-বিপক্ষে মুক্তভাবে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করা যায়।

বিশ্বে সর্বপ্রথম গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় সুইডেনে। ১৭৬৬ সালের ডিসেম্বরে, সুইডেনের ফেডারেল সরকার সরকারী কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশ সীমিত করার এবং সংবাদ সেন্সর করার বিশেষ অধিকার বাতিল করে। নাগরিকরা বাধাহীনভাবে তাদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে 'দ্যা ফ্রিডম অব প্রেস অ্যাক্ট' ছিলো প্রথম পদক্ষেপ।[২৩] এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা ও উন্নত বিভিন্ন দেশ গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য আইনি ও সাংবিধানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৭৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে গণমাধ্যমে স্বাধীনতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে, এটিকে বাক্‌স্বাধীনতার সাথে সংযুক্ত করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় (The Universal Declaration of Human Rights) 'মতামত ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা... যে কোনো গণমাধ্যমে এবং সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও ধারনা খোঁজা, গ্রহণ ও প্রদানের স্বাধীনতা' অন্তর্ভুক্ত করা হলে অন্যান্য অনেক দেশেও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য নীতি গ্রহণ করা হয়। তবে, দেশভেদে গণমাধ্যমের সত্যিকারের স্বাধীনতার প্রকৃত উপস্থিতির ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। পশ্চিমা অনেক দেশে অধিকাংশ মানুষ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে যা কল্পনা করে, সেটিই তাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ধারণার আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হলেও, এটি মনে করার কারণ নেই যে, গণমাধ্যম মার্কিন সম্পূর্ণ স্বাধীন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯ শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

[১৯] https://gijn.org/investigative-journalism-defining-the-craft/
[২০] https://www.u4.no/publications/media-and-corruption.pdf
[২১] http://bit.ly/4a0T51l
[২২] Aminuzzaman, Salahuddin M. and Khair, Sumaiya, Governance and Integrity: The National Integrity Systems in Bangladesh, The University Press Limited (UPL), 2017
[২৩] https://study.com/learn/lesson/what-is-freedom-of-the-press-history-examples.html

বাকস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ‘গুপ্তচরবৃত্তি এবং রাষ্ট্রদ্রোহ আইন পাস করা হয়। ১৯৬৯ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এক রায় দেন যে, যেসব প্রকাশনায় ‘আইন বহির্ভূত কাজ’ (imminent lawless action) করতে প্রভাবিত করে, সেগুলো নিষিদ্ধ করা যেতে পারে; আর এই বাক্যাংশটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। এরপর ১৯৭১ সালে, নিউইয়র্ক টাইমস বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে, মার্কিন গণমাধ্যমে স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়।

সুইডেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ বছরেরও আগে (১৭৬৬ সালে) গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে আইনীভাবে নিশ্চিত করে। তবে সেখানে নানা সময় সংবাদপত্রের প্রকৃত স্বাধীনতার চিত্র ওঠানামা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৭৭২ সালে রাজা তৃতীয় গুস্তাভ তার এবং তার শাসনামলের সমস্ত সমালোচনা বন্ধ করেছিলেন। এর চল্লিশ বছর পর, ১৮০৯ সালে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টি সুইডিশ সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হলে তা রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়।[২৪]

অন্যদিকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও নানা উত্থান-পতন দেখা যায়। তাইওয়ানে ১৯৭৭ সালে সরকারী নেতাদের সমালোচনা এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতা বা প্রার্থীদের প্রকাশ্যে সমর্থন করে– নাগরিকদের এমন চিন্তাভাবনা প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়। যদিও, পরবর্তীতে অনেক বছর গণমাধ্যম অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ছিল। এসময় কোন নির্দিষ্ট সংবাদ বা আধেয় প্রকাশের পূর্বে সরকারকে না জানানো বা জানাতে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন প্রকাশ স্থগিত করা হয়েছে বা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান বিষয়ক আলোচনা ব্যতিত, কার্যত গণমাধ্যমের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তবে সেখানেও কোনো না কোনোভাবে সেন্সরশিপ আছে। যেমন, নির্দিষ্ট কিছু কোড অব এথিকস্ এবং স্বনিয়ন্ত্রণের সুনির্দিষ্ট কিছু মানদন্ডের মাধ্যমে সাংবাদিক ও লেখকদের নির্দিষ্ট অনেক বিষয়ে লেখা বা সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ নিষিদ্ধ। বিশেষ করে, মুক্ত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিক কিংবা প্রকাশকদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গবেষণা কিংবা ‘ফ্রিল্যান্স’ লেখাকে নিরুৎসাহিত করা হয়।

প্রখ্যাত গণমাধ্যম বিষয়ক পণ্ডিত, মার্কিন অধ্যাপক জন এ. লেন্ট এর মতে, হংকং ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত এশিয়ার অন্যতম মুক্ত গণমাধ্যমের দেশ ছিলো। ১৯৭৫ সালের ‘আপত্তিজনক প্রকাশনা বিল’ (Objectionable Publications Bill, 1975), ব্যতিত সেখানে সরকার গণমাধ্যমের বিষয়ে খুব কমই হস্তক্ষেপ করতো। এই বিলটি পরোক্ষভাবে পর্নোগ্রাফি প্রকাশ বা প্রচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে করা হলেও, সমালোচকরা মনে করেন যে, সরকার যা ছড়াতে দিতে চায় না, এমন বিষয়ে আইনটি ব্যবহার করার সুযোগ ছিলো। কিন্তু ২০২০ সালের জুন মাসে, চীন ‘রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ’ বলে বিবেচিত যে কোনো কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করার জন্য একটি ‘তদারকি আইন’ পাশ করলে, সেখানেও অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকী বন্ধ হয়ে যায় এবং সেগুলোর সম্পাদক ও লেখকদের গ্রেফতার করা হয়। যদিও অনলাইন কিছু প্রকাশনা এর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে।

লক্ষণীয় যে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে সমর্থন করার দাবি করে, এমন গণতান্ত্রিক এবং অন্যান্য অনেক দেশ গোপনে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলো আরো প্রকাশ্যে বা সরাসরিভাবে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায় যে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ধারণা বাস্তবের চেয়ে বরং আদর্শিক।[২৫]

ইউনেস্কোর প্রকাশিত ‘World Trends in Freedom of Expression and Media Development: Global Report 2021/2022-এর তথ্য মতে, গত পাঁচ বছরে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, বহুত্ববাদ (Pluralism) ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তার অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বিশ্বজুড়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিস্থিতি উদ্বেগজনকভাবে নিম্নগামী। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের ৮৫ শতাংশ

[২৪] প্রাগুক্ত২৩
[২৫] প্রাগুক্ত২৩

জনসংখ্যার অভিজ্ঞতা বলে, শেষ পাঁচ বছরে তাদের দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছ। এ সময়কালে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে নতুন আইনী ব্যবস্থা জোরদারের পরিবর্তে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে, কয়েক ডজন দেশ অনলাইনে মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে হুমকির মুখে ফেলে, আইনের এমন সংশোধন করেছে বা নতুন আইন ও প্রবিধান গ্রহণ করেছে।[২৬]

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাংবাদিকরা ব্যাপক হামলা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ২০১৬ থেকে ২০২১ এর শেষ পর্যন্ত, UNESCO ৪৫৫ সাংবাদিকের হত্যাকান্ডের তথ্য পেয়েছে– যারা হয় তাদের কাজের জন্য বা পেশাগত দায়িত্বপালনের সময় হামলার শিকার হয়ে মারা গেছেন। পাশাপাশি সাংবাদিকদের কারাদন্ডের রেকর্ডও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।[২৭] কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, গাজায় ইসরালের সাম্প্রতিক চলমান হামলায় গতকাল পর্যন্ত ৬৩ জন সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন, ১১ জন আহত হয়েছেন, ১৯ জন আটক হয়েছেন এবং ৩ জন নিখোঁজ আছেন।[২৮]

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা বাহুল্য নয় যে, বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম ও বাক্স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। আর এতে করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ঝুঁকি ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বনাম বাক্স্বাধীনতার অপরাধ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটেছে। ১৯৯০ এর পর গণতান্ত্রিক নতুন যুগের সূচনায় বাংলাদেশের গণমাধ্যম-কাঠামো, বিষয়বস্তু, ব্যবহার ও মালিকানায় নানা ধরণের পরিবর্তন দেখা যায়। নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং বিশ্বায়নের অনস্বীকার্য প্রভাবে এদেশের গণমাধ্যমও প্রভাবিত হয়েছে। এছাড়া নয়া উদারবাদী নীতিমালা বাংলাদেশকে মুক্ত অর্থনীতির দেশে পরিণত করায় সেখানে নয়া গণমাধ্যম তথা নিউ মিডিয়ার উত্থানের ফলে প্রতিযোগিতাও বেড়ে গেছে। ফলে বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখা যায়।[২৯] এদেশে গণমাধ্যমের উল্লম্ফন হলেও, নানাবিধ চ্যালেঞ্জের কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা নিবিড় হয় নি। এর মধ্যে অন্যতম হলো নিয়ন্ত্রিত বাজার ও কর্পোরেট পুঁজির প্রভাব, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনী ও নীতিকাঠামো এবং এর ফলস্বরূপ 'সেল্ফ সেন্সরশিপ'।

দেশে গণমাধ্যম খাতে ব্যাপক কর্পোরেট পুঁজির প্রবেশ ঘটেছে। ব্যাংক, বীমা, বিদ্যুৎ, রিয়েল এস্টেট ও অন্যান্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সর্বোপরি ব্যবসায়িক গ্রুপের মালিকানাতেই অধিকাংশ গণমাধ্যম অনুমোদন পেয়েছে। সুনির্দিষ্ট তথ্যে দেখা যায়, শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মালিকানাতেই ৭টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দেশের অন্তত ৩২টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অধীনে ৪৮টি গণমাধ্যম রয়েছে।[৩০]

রাষ্ট্রীয় নানা আইনী ও নীতিকাঠামোও বর্তমানে গণমাধ্যম ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এসব আইন যে কোনো সময় যে কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ব্যবহারের হুমকি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট ১৯২৩, এবং পেনাল কোড ১৮৬০ এর বিভিন্ন ধারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদাহরণ আছে। এসব আইনে ব্যক্তির মানহানি, মিথ্যা তথ্য প্রকাশ, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা লঙ্ঘন কিংবা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর বিবেচনায় মামলা করার সুযোগ আছে। আবার তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ বেড়েছে ভাবা হলেও এ আইনের কিছু সীমাবদ্ধতায় তা ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ সীমিত।[৩১]

---

[২৬] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380618/PDF/380618eng.pdf.multi

[২৭] প্রাগুক্ত২৫

[২৮] https://cpj.org/2023/12/journalist-casualties-in-the-israel-gaza-conflict/

[২৯] Riaz, Ali and Rahman, Mohammad Sajjadur, Who Owns the Media in Bangladesh?, Center for Governance Studies, 2021

[৩০] প্রাগুক্ত[২৩]

[৩১] প্রাগুক্ত[১৩]

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বর্তমানে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে অন্তত নয়টি আইন প্রয়োগ হচ্ছে, যার সবশেষ সংস্করণ ছিলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন; যদিও সম্প্রতি এর নাম ও কিছু ধারা পরিবর্তন হয়ে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে। তবুও তা গণমাধ্যম ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য হুমকি হিসেবেই থেকে গেছে। এছাড়া আরও চারটি আইন খসড়া পর্যায়ে আছে, নতুন নতুন আইন প্রণয়নেও তোড়জোড় চলছে।[৩২]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্য অনুযায়ী, পূর্বের আইসিটি আইন ২০১৩ এর অধীনে ২০১৮ সালের এপ্রিল পুলিশ ১,৩০০টি মামলা নথিবদ্ধ করে, যার অধিকাংশই বিতর্কিত ৫৭ ধারায় দায়ের করা। এরপর ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে পাশ হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। যা আইসিটি আইন থেকেও ভয়ংকর হয়ে দেখা দেয়। ৫ জুন (২০২৩) জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান, ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এ আইনের অধীনে ৭ হাজারেরও বেশি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৩৩] অর্থাৎ এই আইনের অধীনে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ৪টি মামলা হয়েছে। সম্প্রতি বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করে নতুন নামে সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ তৈরি হয়, কিন্তু এতে কিছু শাস্তি হ্রাস, ব্যাখ্যা প্রদান ব্যতিত পুরনো দুই আইনের অধিকাংশ নিবর্তনমূলক ধারাই হুবহু কিংবা ভিন্ন ভাষায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে। মানহানির মামলার মতো কিছু ক্ষেত্রে জেল প্রদানের পরিবর্তে জরিমানার পরিমান কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে অ-জামিনযোগ্য বিভিন্ন ধারা জামিনযোগ্য করা হয়েছে।[৩৪] তবে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার সূত্রে জানা যায় যে, নতুন এই আইনে ১৭, ১৯, ২৭, ৩০ ও ৩৩ এর মতো অন্তত ৬টি ধারা এখনো অজামিনযোগ্য রাখা হয়েছে।[৩৫] ফলশ্রুতিতে সাইবার স্পেসে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য যে আইনের জন্ম, তা এখনও উদ্দিষ্ট নিরাপত্তা নিশ্চিতের চেয়ে সংবিধানবদ্ধ বাক্স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের জন্য হুমকি হয়ে আছে, কথা বলাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য ওঁৎ পেতে আছে! এর বাইরে অধিকার ক্ষুন্নকারী ঔপনিবেশিক আমলের প্রাচীনতম নানা আইনের ব্যবহার তো আছেই!

গণমাধ্যম তথা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য প্রতিবন্ধক এসব আইনের ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যবহারে বাক্স্বাধীনতার অধিকার চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনার ফলস্বরূপ, গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সংখ্যা ও মান ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০২২ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কারের জন্য শতাধিক প্রতিবেদন জমা পড়লেও, এবছর এই সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। এতে ধারাণা করা যায় যে, মানসম্মত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সংখ্যাও কমে এসেছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০২৩ সালের শুরু থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ২৬০ জন সংবাদকর্মী নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন; যার মধ্যে ৭২ জন পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আক্রমনের সম্মুখীন হয়েছেন এবং ২৫ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর হাতে হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া এ সময়কালে সংবাদ প্রকাশের জেরে সংবাদকর্মীদের বিরুদ্ধে অন্তত ৪৮টি মামলা হয়েছে; আর তথ্য সংগ্রহের সময় কিংবা প্রকাশিত সংবাদের জেরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে অন্তত ২২ জন সংবাদকর্মী নিপীড়ন, হুমকি কিংবা হয়রানির শিকার হয়েছেন।[৩৬] এমনকি এ বছর টেলিভিশন প্রতিবেদন ক্যাটাগরিতে টিআইবির অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার বিজয়ী প্রতিবেদনটির জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক অভিযুক্তদের দ্বারা হামলার শিকার হয়েছেন। এছাড়া, বহু অনুসন্ধানী সাংবাদিককে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে, অনেকে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন বা চাকুরিচ্যুত হয়েছেন। প্রকাশিত বা প্রচারিত প্রতিবেদনের দায়ে মামলার ঘানি টানছেন।

আবার আইনী কাঠামোর বেড়াজাল ও ক্রমাগত নিপীড়ন-নির্যাতন ও হুমকির মুখে সংবিধান প্রদত্ত সংবাদ ও মত প্রকাশ তথা বাক্স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার ফলে বিগত বছরগুলোতে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহে ‘সেল্ফ

[৩২] https://www.bbc.com/bengali/articles/c8vr1jmyn04o

[৩৩] https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-485081

[৩৪] প্রাগুক্ত[২৭]

[৩৫] https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/cyber-security-act-will-not-stop-criminalising-freedom-expression-3393326

[৩৬] https://www.askbd.org/ask/2023/11/09/journalist-harassment-jan-oct-2023/

সেন্সরশিপ’ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বিধিনিষেধ না থাকলেও অনেক প্রতিষ্ঠানই নিজের মত করে সরকার, রাজনৈতিক দল কিংবা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেতে পাওে, এমন প্রতিবেদন প্রকাশে বিরত থাকেন কিংবা কাঁটছাট করে প্রকাশ করেন। বেসরকারী মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলো রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয় বা ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনামূলক বিষয়গুলোর বাইরে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকলেও রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং ‘সেল্ফ সেন্সরশিপ’ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া অনুসন্ধানী সাংবাদিকগণ প্রায়ই অভিযোগ করেছেন যে, তাদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সম্পাদকরা সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থার চাপের ভয়ে তাদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলো ‘হত্যা’ (ছাপায় নি বা প্রকাশ করেনি) করেছে।[৩৭]

শতাব্দী প্রাচীন অফিসিয়াল সিক্রেটস আইন, ১৯২৩ এর ‘সরকারী গোপনীয়তা ফাঁস’ সংক্রান্ত ধারা ও তার প্রয়োগে কঠিন সাজার হুমকিতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা প্রবল ঝুঁকির মুখে পতিত হয়েছেন। অথচ বিপরীতে এটি সরকারের জবাবদিহি এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারতো।[৩৮]

বিদ্যমান বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে কেউ কেউ বিজ্ঞাপন প্রাপ্তি কিংবা ‘টিকে থাকা’র চিন্তা থেকে ‘সেল্ফ সেন্সরশিপ’-এর কৌশল অবলম্বন করলেও, অধিকাংশ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান– কাঠামোর অংশ হিসেবেই ‘সেল্ফ সেন্সরশিপ’-এর আশ্রয় নিয়ে টিকে আছে। দীর্ঘকাল পুঞ্জীভূত এই প্রবণতার ধারাবাহিকতায় টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনামলে মিডিয়ার ব্যাপারে সরকারের চাহিদা, প্রচারিত ভাষ্যের ধরণ এবং তা অনুসরণ না করার ফলে রোষের উদাহরণ বিবেচনায় নিয়ে অধিকাংশ মিডিয়াই ‘নিরাপদ সাংবাদিকতা’র পথ বেছে নিয়েছে। এমনকি আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচারিত ও প্রকাশিত সংবাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কারণ সম্পাদকীয় নীতিমালা ছাড়িয়ে মাঠ প্রতিবেদকের কাছেও এই ‘সেল্ফ সেন্সরশিপ’ কাঠামো পরিচিত ও অবশ্য পালনীয় হিসেবে বিবেচ্য হচ্ছে। এতে করে সরকারের কঠোর নজরদারিরও আর প্রয়োজন পড়ছে না।[৩৯]

কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে)-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ সাংবাদিকদের জন্য অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্র। ১৯৯২ সাল থেকে অন্তত ৩৪ জন সাংবাদিক পেশাগত কারণে নিহত হয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, প্রশাসন সাংবাদিকের শারিরীক ও পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিতে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয় নি।[৪০] সাংবাদিকদের অবাধে সংবাদ প্রকাশের সীমাবদ্ধতা, সীমিত বাক্‌স্বাধীতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার ফলস্বরূপ গণমাধ্যম, মতপ্রকাশ ও মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের ক্রমাবনতি হচ্ছে। যেমন, রিপোর্টার্স উইদআউট বর্ডার (আরএসএফ)-কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৩ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমাবনতি হয়ে ১৬৩তম, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যম কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে, তার ভিত্তিতে ২০০২ সাল থেকে আরএসএফ এই সূচক প্রকাশ করে আসছে, যাতে বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে ২০১৩ সালে। আরএসএফের প্রতিবেদনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার (অতি সংকটজনক (Very Serious- 31 Countries), অসুবিধাজনক (Difficult- 42 Countries), সমস্যামূলক (Problematic- 55 Countries), সন্তোষজনক ও ভালো (Good or Satisfactory- 52 Countries) পাঁচটি শ্রেণীর মধ্যে বাংলাদেশ ‘অতি সংকটজনক’ (Very Serious) শ্রেনীতে (পরিস্থিতিতে) আছে।[৪১]

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে আইনী কাঠামোর বাইরেও সাংবাদিকতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মান্ধাতার আমলের ঔপনিবেশিক আইনের সুযোগ নিয়ে এবং সেগুলো ভিত্তি ধরে প্রণীত অধুনা কিছু আইনের ফাঁদে ফেলে সাংবাদিকতা তথা সাংবাদিকের কথা বলার, বাক্‌ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা,

---

[৩৭] https://bd.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/70/Human-Rights-Report.pdf

[৩৮] প্রাগুক্ত[৩৭]

[৩৯] https://www.bbc.com/bengali/news-57273644

[৪০] https://cgs-bd.com/article/12251/Silenced-Voices--The-Threat-to-Freedom-of-Speech-in-Bangladesh

[৪১] MAP - 2023 World Press Freedom Index | RSF

এমনকি চিন্তার স্বাধীনতাকেও অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারের আইন ও তথ্যমন্ত্রীসহ জ্যেষ্ঠ কয়েকজন সাংবাদিকও বিভিন্ন সভা-সেমিনারে কিংবা প্রকাশিত লেখায় সংবাদ প্রকাশের দায়ে হয়রানির শিকার সাংবাদিকদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস করেছেন। এমনকি প্রকাশিত সংবাদকে 'অপপ্রচার' অভিহিত করে সাংবাদিকতা ও 'অপপ্রচার'কে গুলিয়ে না ফেলার উপদেশ দিয়েছেন।[৪২] আবার অনেকে 'নো জার্নালিজম' শব্দবন্ধনীর মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সাংবাদিকের সংবাদ প্রকাশকে অপরাধ হিসেবে প্রত্যায়িত করার প্রয়াস নিয়েছেন।[৪৩] এসব আচরণ ও প্রয়াসকে ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ বিভিন্ন আইনের 'বাইপ্রোডাক্ট' হিসেবে কিংবা ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার স্বযত্ন লালন হিসেবে দেখা যেতে পারে।

এর বাইরে সম্প্রতি উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরে, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেখানে খোদ 'গণতন্ত্র'ই উন্নয়নের জন্য 'উটকো ঝামেলা' হিসেবে হাজির হয়েছে। আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র'– এমন ডিসকোর্স শক্তিশালী হয়েছে বা হচ্ছে। অথচ উন্নয়নের অপরিহার্যতা বিবেচনায় রেখেও খোদ উন্নয়নের জন্যই গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, বাক্স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যকীয়। অমর্ত্য সেনের মতে, উন্নয়নের জন্যই মুক্ত আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক সমাজে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটায়, মূল্যবোধ ও জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে সামাজিক ন্যয়বিচার সহজলভ্য হয়।[৪৪]

অথচ বর্তমানে কথা বলার অধিকার তথা বাক্স্বাধীনতাকেই ক্ষমতাশালীরা অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করছেন। এজন্যই বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও নোয়ম চমস্কি বলেছেন, 'তুমি যদি বাক্স্বাধীনতায় বিশ্বাস করো, তবে তোমার বিরুদ্ধ মতের বাক্স্বাধীনতায়ও তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। স্ট্যালিন বা হিটলারের মত একনায়কেরা শুধু স্বপক্ষের বাক্স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন।'[৪৫]

উপসংহার ও করণীয়

উপনিবেশ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি পেরিয়ে, অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের মাইলফলকে উন্নীত হয়েছে। অথচ এই একবিংশ শতাব্দীতেও এদেশে মানহানি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ধর্মীয় অবমাননা, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ভঙ্গ কিংবা জাতীয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতীকের অবমাননার অভিযোগকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে, শত বছরের প্রাচীন নীপিড়নমূলক বিভিন্ন আইনের চর্চা ও প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে। বাক্স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণমূলক নতুন নতুন আইন হয়েছে ও হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আইনকানুন যখন ধীরে ধীরে নিবারণমূলক দন্ডবিধি থেকে সরে আসছে, তখনও এই ধরণের চর্চা ঔপনিবেশিক চেতনাকে লালন করারই নামান্তর। রাজা-রাণী ও চার্চের সুরক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি ঔপনিবেশিক অঞ্চলে শাসন ও শোষন টিকিয়ে রাখার জন্য যে ইংল্যান্ড এসব নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করেছিলো, খোদ সেখানেই এসব আইনের পরিবর্তন হয়ে গেছে। মানহানির মত অপরাধকে সেখানে আর ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। অথচ আমরা এখনও তাদের ঔপনিবেশিক 'হেজিমনি'র বাইরে যেতে পারি নি।[৪৬]

গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাদেশে যতো আইন হয়েছে এর বেশিরভাগ ১৮৬০ সালের ফৌজদারি দন্ডবিধি আইন দ্বারা প্রভাবিত। এই দন্ডবিধির ১২৪ এর 'ক' ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কথায়, লিখে, কোনো চিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে সরকারের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তাকে যাবজ্জীবন বা এর কম মেয়াদের কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হবে। অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। আইনটি ১৬৩ বছর আগে, ব্রিটিশ উপনিবেশকালে প্রণয়ন করা হয়েছিলো। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের প্রায় সব দেশ এই আইন অনেক আগেই বাতিল করেছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও পাকিস্তানে লাহোর হাইকোর্ট

---

[৪২] https://www.newsbangla24.com/news/222977/Journalism-cannot-be-mixed-with-crime-and-propaganda-Information-Minister
[৪৩] https://www.kalerkantho.com/online/miscellaneous/2023/04/02/1267103
[৪৪] https://kathakata.com/freedom-of-speech-and-bangladesh/
[৪৫] প্রাগুক্ত[২১]
[৪৬] https://rashtrochinta.org/blog-post/cyber-security-colonial/

এই আইনকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল ঘোষণা করেছে। এই অঞ্চলে শুধুমাত্র বাংলাদেশে এই আইন বা এর দ্বারা প্রভাবিত আইন প্রবলভাবে ব্যবহার হচ্ছে।”[৪৭]

এক থেকে দেড় শতাব্দী প্রাচীন (যেমন দন্ডবিধি, ১৮৬০) এসব আইনের ব্যবহার সংবিধান (বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ) ও আন্তর্জাতিকভাবে (Universal Declaration on Human Rights) স্বীকৃত বাক্‌স্বাধীনতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে, একে অপরাধ হিসেবেও চিহ্নিত করে, মত প্রকাশের অধিকারকে সঙ্কুচিত করে, তথ্য প্রকাশ ও সংবাদ বর্ণনাকে কঠিন করে তুলে। তাই অবিলম্বে দন্ডবিধি, ১৮৬০ সহ সংশ্লিষ্ট সকল আইন– বিশেষ করে সাইবার নিরাপত্তা আইন, খসড়া গণমাধ্যম কর্মী আইন ঢেলে সাজানো এবং আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পুনঃপ্রণয়ন ও প্রণয়ন জরুরি।

এছাড়া, গণমাধ্যম সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালাসমূহ (সম্প্রচার নীতিমালা, অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, সংবাদপত্র নীতিমালা এবং চলচ্চিত্র নীতিমালা) আলাদাভাবে প্রণয়ন করার চেয়ে সব ধরনের গণমাধ্যমের জন্য একটি অভিন্ন নীতিমালা থাকা সমীচীন। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত সম্প্রচার আইন, ২০১৬ ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে আইনটি অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে, সময়োপযোগী সংশোধনের মাধ্যমে, গণমাধ্যম ও সম্প্রচার আইন হিসেবে নামকরণসহ এর আওতায় প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের সবাইকে নিয়ে আসা সম্ভব। এছাড়া প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের নাম গণমাধ্যম ও সম্প্রচার কমিশন রাখা হলে এবং প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের সবাইকে স্বায়ত্বশাসিত, একক ও অভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা হলে গণমাধ্যম আইন গণমাধ্যম কর্মী, সাধারণ মানুষ ও আইন অঙ্গনে যে অস্পষ্টতা রয়েছে সেসব সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে। তবে এই কমিশন সম্পূর্ণভঅবে সরকারের নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে হতে হবে।

সবশেষে, বাক্, মত ও চিন্তার স্বাধীনতার বিকল্প, শুধু এর পূর্ণ স্বাধীনতাই হতে পারে। কোনো বিরুদ্ধ মত দমনের মাধ্যমে কখনোই কোনো উন্নত ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। আমাদের স্বাধীনতা তথা স্বনিয়ন্ত্রনের লড়াইও ছিলো এ ধরণের বিভিন্ন আইন ও শোষণমূলক নীতির বিরুদ্ধেই। এই লড়াই আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি আমাদের আধুনিকতা, গণতান্ত্রিক চেতনা, নাগরিক অস্তিত্ব ও সমাজের অগ্রগতির দিকনির্দেশ করে। তাই বাক্, মত ও চিন্তার শর্তহীন স্বাধীনতা নিশ্চিতে সাংবাদিক, নাগরিক সমাজসহ সরকার, রাষ্ট্র– সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় সব কিছু করাটাই এখন দায়িত্ব।

---সমাপ্ত---

জাফর সাদিক
সহসমন্বয়ক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

[৪৭] প্রাগুক্ত[২৬]